গল্প

রামের সুমতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

রামের সুমতি

এক

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন্ দিক দিয়া কিভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু, সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারিতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু'-দশ ঘর বাগদী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল।শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন, –সে আজ তের বছরের কথা–সেই বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বৎসরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তেরো বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের একটাকা ভিজিট দু'টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া অ্যারারুট ও ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ির দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চার টাকা ভিজিট—আসতে পারবে না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আন গে।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, কেন তুমি অত ব্যস্ত হচ্চ? ডাক্তার না হয় কালই আসবে, একদিনে আর কি ক্ষেতি হবে?

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারা তলায় বসিয়া পাখির খাঁচা তৈরি করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক নেত্য, আমি যাচ্চি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো, রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস আমার, যাসনে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা, ঝগড়া করতে নেই।

রাম কর্ণপাতও করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়া ছিল, কহিল, খাঁচা বুনবে না কাকা?

বুনবো অখন, বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে? দেখ, কি কাণ্ড বা করে আসে।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি করব? তোমার মানা শুনল না, আমার মানা শুনবে?

হাত ধরলে না কেন? ও হতভাগার জন্যে আমার একদণ্ডও যদি বাঁচতে ইচ্ছা করে! ও নেত্য, লক্ষ্মী মা আমার, দাঁড়িয়ে থাকিস নে—ভোলাকে পাঠিয়ে দে গে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক—সে হয়ত এখনো গরু নিয়ে মাঠে যায়নি।

নেত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্‌পেন্‌সারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারির সামনে একটা ভাঙ্গা টেবিলে বসিয়া নিক্তিহাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি-পাঁচজন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, আমি কি করব—ওষুধ দিচ্ছি—

ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভালো হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন, নিক্তি সব তুলিয়া চোখ রাঙ্গা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত বড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্ধা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো, তবে নিতে আসিস কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে আর ডাক্তার নেই, তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না।

লোকগুলা স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্বার বলিল,—তুমি ছোট জাত, বামুনের মান-মর্যাদা জান না, তাই বলে ফেললে,—পায়ে ধরে

ডাকতে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সদ্যই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরি ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেচ, বেশী বড় হয়নি ত,—ও কুড়ুলের এক-এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে এই শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব ক'রো না। ভাল ওষুধ লুকানো-টুকানো যা আছে, তাই নিয়ে যাও। ও রামঠাকুর—যা বলে গেছে তা ফলাবে, তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিলেন, আমি থানায় দারোগার কাছে যাব, তোমরা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী! সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার ত কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁভোঁ করতেছে—রামঠাকুর কি যে বলে গেল, তা শুনতেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখতে ছোট, কিন্তু ওনার বাগদী ছোকরার দলটি ছোট নয়। ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে থানার লোক দেখতে আসবে না, দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়ে উপকার করবে! ও-সব আমরা পারব না—ওনাকে সবাই ডরায়। তার চেয়ে যা বলে গেছে, তাই কর গে। একবার হাতটা দেখ দেখি আপনি—আজ দুখানা রুটি-টুটি খাব নাকি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, সাক্ষী দিবিনে তোরা? তবে দূর হ' এখান থেকে। আমি কারুর হাত দেখতে পারব না—মরে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না—দেখি, তোদের কি গতি হয়।

বৃদ্ধ লাঠিটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল—দোষ কারো নয় ডাক্তারবাবু, উনি বড় শয়তান। ঠাকুরকে খবরটা একবার দিয়েও যেতে হবে, না হলে, হয়ত বা মনে করবে, থানায় যাবার মতলব আমরাই দিয়েছি। বিঘেটাক বেগুন-চারা লাগিয়েছি—বেশ ডাগর হয়েও উঠেছে—হয়ত আজ রাত্তিরেই সমস্ত উপড়ে রেখে যাবে। বাগদী ছোঁড়াগুলো ত রাত্তিরে ঘুমোয় না। বাবু, থানায় না হয় আর একদিন যেয়ো—আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে গিয়ে ওনারে ঠান্ডা করে এসো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা—সংসারের সর্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেলেন,—দুনিয়ার কোন শালার ভাল করতে নেই।

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছটফট করিতেছিলেন। রাম বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—গোবিন্দ, খাঁচা ধরবি আয়।

নারায়ণী ডাকিলেন, ও রাম, একবার এদিকে আয়।

রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, এখন না, কাজ কচ্চি।

নারায়ণী ধমক দিয়ে বলিলেন, আয় বলচি শিগগির।

রাম কাঠিগুলা নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তপোশের একধারে পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হ’ ল?

হাঁ।

কি বললি তাঁকে?

আসতে বললুম।

নারয়ণী বিশ্বাস করিলেন না–শুধু আসতে বললি–আর কিছু বলিস নি?

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল না, কি বলেছিস তাঁকে?

বলব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল–ডাক্তারবাবু আসচেন।

নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া, পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না-সারা কি ডাক্তারের হাতে? তোমার দেওরটি ত আমাকে দু'টি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে ত আমার ঘর-দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ-রকম কথা, আপনি কোন ভয় করবেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটা দল আছে। তাদের যে-কথা, সেই কাজ। তাতেই বড় শঙ্কা হয়, মা! আমরা ওষুধই দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারিনে।

নারায়ণী চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্যামলাল রুষ্ট হইয়া বলিলেন, ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে, তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্বনাশ! আমার ভিজিট ত এক টাকা। তার বেশী আমি কোনমতেই নিতে পারব না—ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দু'দিনের কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের।

দুই দিন পূর্বে এইখানেই যে এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হউক, নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন, এবং সংসার আবার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

.

দুই

মাস-দুই পরে একদিন তিনি নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণকলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, নেত্য, সে বাঁদরটা কোথায়?

বাঁদরটা যে কে, তাহা বাটীর সকলেই জানিত।

নেত্য বলিল, ছোটবাবু এই ত ছিল—ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরি কচ্চে।

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ইদিকে আয় হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

রামলাল আধখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণী বলিলেন, সাঁতরাদের এক মাচা শশাগাছ কেটে দিয়ে এসেছিস কেন?

তারা আমাকে কাটতে দেখেছে?

তারা দেখেনি, আমি দেখেছি। কেন কেটেছিস বল্?

আমাকে বুড়ী মাগী অপমান করলে কেন?

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, অপমানের কথা পরে হবে—তুই চুরি কচ্ছিলি কেন, তাই আগে বল্?

রামলাল রীতিমত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, চুরি কচ্ছিলুম? কখ্খন না! এতটুকু একটু শশা নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নারায়ণী আরো জ্বলিয়া বলিলেন, হাঁ বাঁদর! এক শ'বার হয়। বুড়ো-ধাড়ী, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটা জানে। দাঁড়িয়ে থাক্ এক-পায়ে, পাজী, দাঁড়া বলচি। এ বাড়িতে কচি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘন্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুম মত এতক্ষণ সে ঘুড়ি ধরিয়া ছিল, গোলমাল শুনিয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চট করিয়া বলিল, কাকা, দাঁড়াও এক-পায়ে—এমনি করে। বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রণালীটা দেখাইতেছিল—

রাম ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় কষাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া এক-পায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসি চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে তেমনই করিয়াই এক-পায়ে দাঁড়াইয়া, কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে।

নারায়ণী বলিলেন, আচ্ছা যা, হয়েছে। আর এমন করিস নে।

রাম সে কথা শুনিল না। রাগ করিয়া তেমনিভাবে এক-পায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নারায়ণী কাছে আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া টানিতে গেলেন, সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবলবেগে ঝাড়া দিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিল; তিনি হাসিয়া আর একবার টানিবার চেষ্টা করিতেই সে পূর্বের মত সবেগে ঝাড়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া এক দৌড়ে বাহিরে পলাইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল, চন্ডীমন্ডপের ও-ধারের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, ইস্কুলের সময় হয়নি ছোটবাবু? মা ডাকচেন।

রাম জবাব দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই, এইভাবেই বসিয়া রহিল।

নৃত্য সামনে আসিয়া বলিল, মা চান করে খেয়ে নিতে বলচেন।

রাম চোখ রাঙ্গাইয়া গর্জিয়া উঠিল, তুই দূর হ।

কিন্তু মা কি বলেচেন শুনতে পেয়েচ?

না, পাইনি। আমি নাব না, খাব না—কিছু করব না—তুই যা।

আমি গিয়ে বলচি তাঁকে, বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খিড়কির এঁদো-পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—ওরে ও ভূত! ও কি করলি? ও ডোবাটায় ভয়ে কেউ পা ধোয় না, তুই স্বচ্ছন্দে ডুব দিয়ে এলি?

তিনি আঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আনিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়া-ভাতের সুমুখে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার মনের ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী ভাইটি, এ-বেলা তুই আপনি খা, রাত্তিরে তখন আমি খাইয়ে দেব। চেয়ে দেখ এখনো আমার রান্না শেষ হয়নি—লক্ষ্মীটি খাও!

রাম তখন ভাত খাইয়া জামা পরিয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, তোমার জন্যই ওর সব-রকম বদ অভ্যাস হচ্চে মা! অত বড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া কি! একটু রাগ করলেই খাইয়ে দিতে হবে—ও আবার কি কথা!

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, না হলে খায় না যে। রাত্তিরের লোভ না দেখালে ও ঐখানে একবেলা ঘাড় গুঁজে বসে থাকতো—খেত না।

নৃত্যকালী বলিল, না, খেত না! ক্ষিদে পেলে আপনি খেত। অত বড় ছেলে—

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোরা ওর বয়সই দেখিস! বড় হলে, বুদ্ধি হলে ওর আপনিই লজ্জা হবে। তখন আর কোলে বসতে চাইবে, না, খাইয়ে দিতে বলবে?

নৃত্যকালী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, ভালর জন্যই বলি মা, নইলে আমার দরকার কি? ষোল-সতর বছর বয়সে যদি ওর জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়, তবে হবে কবে?

নারায়ণী এবার রাগ করিলেন। বলিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেত্য। কারো বা দু'বছর আগে, কারো বা দু'বছর পরে হয়। আর হোক ভাল, না হোক ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?

নেত্য বলিল, ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি-রকম দুষ্টু হয়ে উঠেচে তা ত নিজেও দেখতে পাচ্ছ। পাড়ার লোকে বলে, তোমার আদরেই ও–

নারায়ণী রুক্ষস্বরে বলিলেন, পাড়ার লোকে আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না।

কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স, সমস্ত সকালবেলাটা যে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান জানেন, জ্বর হবে, না কি হবে, তার পরে কি বলিস উপোস করিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য না, নেত্য। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

এই কথা লইয়া কাল রাত্রে স্বামীর সঙ্গেও যে সামান্য কলহ হইয়া গিয়াছিল, সে কথা নেত্য জানিত না। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সে বলিল, ও কি মা, কাঁদ কেন? মন্দ কথা ত আমি কিছু বলিনি। লোকে বলে, তাই একটু সাবধান করে দেওয়া।

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, সকল মানুষকে ভগবান একরকম গড়েন না। ও একটু দুষ্টু বলেই আমি যার তার কথা চুপ করে সহ্য করি, কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি ব'লে? তারা কি চায়, ওকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি? তা হলেই বোধ করি, তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বলিয়া কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

নেত্যকালী এতটুকু হইয়া গিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, জানি না বাপু! সব বিষয়ে যে-মানুষের এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য, সে কেন এইটুকু কথা বুঝতে পারে না ? আর শাসন ত ভারী! ছেলে এক মিনিট এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেচে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে!

দাদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে রাম একেবারে পছন্দ করিত না। আজ রাত্রে ইছা করিয়াই নারায়ণী দুই ভাইয়ের খাবার পাশাপাশি দিয়া অদূরে বসিয়াছিলেন। রাম ঘরে ঢুকিয়াই লাফাইয়া উঠিল। যাও, আমি খাব না—কিছুতেই খাব না।

নারায়ণী বলিলেন, তবে শুগে যা।

তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রামের লাফানি বন্ধ হইল, কিন্তু, সে খাইতে বসিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরে আর একটা দরজা দিয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিতেই রাম ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। শ্যামলাল ধীরে-সুস্থে খাইতে বসিয়া বলিলেন, রেমো খেলে না যে?

নারায়ণী সংক্ষেপে বলিলেন, ও আমার সঙ্গে খাবে।

আহার শেষ করিয়া শ্যামলাল চলিয়া যাইবামাত্রই রাম একমুঠো ছাই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি কাউকে খেতে দেব না—সকলের পাতে ছাই দিয়ে দেব—দিই?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, দিয়ে একবার মজা দেখ না!

রাম ছাই-মুঠা হাতে করিয়া সুর বদলাইয়া বলিল, ভারী মজা, সকালবেলা আমাকে ঠকিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়ে এখন মজা দেখ না!

তুই খেলি কেন?

তুমি যে বললে রাত্তিরে–

বুড়ো খোকা, পরের হাতে খেতে তোর লজ্জা করে না?

রাম আশ্চর্য হইয়া বলিল, পরের হাতে কোথায়! তুমি যে বললে!

নারায়ণী আর তর্ক না করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, যা–ছাই ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে আয়। কিন্তু আর কোনদিন খেতে চাস্!

খাওয়ানো তখনো শেষ হয় নাই, নৃত্যকালী বিনা প্রয়োজনে একবার দরজায় সম্মুখ দিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও-দিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

নারায়ণী দেখিয়া বলিলেন, রাম, কখনও কি একটু শান্ত হবিনে ভাই! ভগবান কোনদিন কি তোর একটু সুমতি দেবেন না? লোকের কথা যে আমি আর সহ্য করিতে পারিনে।

রাম মুখের ভাত গিলিয়া লইয়া বলিল, কে লোক তার নাম বল।

নারায়ণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,–বাস্! কে লোক, ওকে তার নাম বলে দাও!

কিন্তু মাস-কয়েক পরে সত্যই নারায়ণীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার বিধবা মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে লইয়া এতদিন কোনমতে তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইটির মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

আজ সকালবেলা রাম দুই-তিন হাত একটা অশ্বত্থ-চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্নস্বরে বলিলেন, ওটা কি হচ্চে রাম?

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বত্থ-গাছটা বড় হলে বেশ ছায়া হবে গো! মাস্টারমশাই বলেছে, অশথের ছায়া খুব ভাল। গোবিন্দ যা, ঘটি করে জল নিয়ে আয়। ভোলা, মোটা দেখে একটা বাঁশ কেটে আন–বেড়া দিতে হবে। নইলে গরুবাছুরে খেয়ে ফেলবে।

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ-গাছ! এমন ছিষ্টিছাড়া কান্ড কখনও বাপের বয়সে দেখিনি বাবা!

রাম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না।

গোবিন্দ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী একটি ছোট ঘটি করিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রাম তাহার হাত হইতে ঘটিটি লইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিল, এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড়া এইখানে, আমি জল আনি গে।

তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া, রাম যখন গাছ-পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ তুঁষের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্ নারাণি, চেয়ে দেখ্! তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্। উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ-গাছ পুঁতে বলে কিনা ছায়া হবে।

আবাব ওদিকে চেয়ে দেখ্ হারামজাদা ভোলার কাণ্ড। একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুকছে–বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই একরাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া আনিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগলামি, সমস্ত জিনিসটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝধানে অশ্বত্থ-গাছ কি হবে রে?

রাম আশ্চর্য হইয়া বলিল, কি হবে কি বৌদি! কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া হবে বল ত, আর এই যে ছোট ডালটি দেখচ, উটি বড় হলে,–এই গোবিন্দ, আঙ্গুল দেখাস নে–বড় হলে গোবিন্দর জন্যে একটা দোলা টাঙ্গিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু করে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে; দে কাটারিখানা, আমার হাতে দে, তুই পারবি নে। খটখট ঠকঠক করিয়া বাঁশ কাটা শুরু হইয়া গেল।

নারায়ণী হাসিতে হাসিতে কক্ষস্থিত পূর্ণকলস রান্নাঘরে রাখিয়া দিতে চলিয়া গেলেন।

রাগে দিগম্বরীর চোখ জ্বলিতে লাগিল। মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই যে কিছু বললি নে? ঐখানে তবে অশ্বত্থ-গাছ হোক?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, মা, ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, অত বড় গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড়-বাকড় আছে যে ঘড়া ঘড়া জল ঢাললেই বাঁচবে? ও ত কালই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া বলিলেন, শুকুবে না ছাই হবে, ভাল চাস ত উপড়ে ফেলে দে গে!

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বাপরে! তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাকবে না।

দিগম্বরী বলিলেন, কেন, বাড়ি কি ওর একলার যে মনে করলেই উঠোনের মাঝখানে এক অশ্বত্থ-গাছ পুঁতে দেবে! তোরা কি কেউ ন'স? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মা গো, অশ্বত্থ-গাছের উপরে এসে রাজ্যের কাক, চিল, শকুনি বাসা করবে, হাড়গোড় ফেলে নোঙরা করবে—আমি ত নারাণি, তা হলে থাকতে পারব না! ওকে তোদের এত ভয়টা কি জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ি হ'ত, নারাণি, তা হলে দেখতুম, ও কতবড় বজ্জাত। একদিনে সোজা করে দিতুম।

নারায়ণী মায়ের বুকের ভিতরটা যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওর এখন বুদ্ধি কি মা! বুদ্ধি থাকলে কি কেউ নিজের বাড়ির উঠোনে অশ্বত্থ-গাছ পোঁতে? দু'দিন থাক, তার পরে ও আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, ফেলে দেবে। ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।

নারায়ণী কহিলেন, না মা, ও-কাজ করো না, তোমাকে বলচি, ওকে চেন না। আমি ছাড়া ওর বড়ভাইও ছুঁতে সাহস করবে না মা! আজকার দিনটা যাক।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই কাপড় ছাড়্ গে যা।

দুপুরবেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিশের অড় সেলাই করিতেছিলেন, নেত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা, সর্বনাশ হয়েচে! দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে। সে ইস্কুল থেকে এসে কাউকে বাঁচতে দেবে না! নারায়ণী সেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছটি নাই।

বলিলেন, মা রামের গাছ কি হ' ল?

দিগম্বরী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওই।

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেটি শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই-খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি, আমার গাছ?

নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বলচি, এদিকে আয়।

না, যাব না। কৈ আমার গাছ?

এদিকে আয় না, বলচি।

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া, মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, মঙ্গলবারে কি অশ্বত্থ-গাছ পুঁততে আছে রে?

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয়?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হলে বাড়ির বড়বৌ মরে যায় যে!

রাম একমুহূর্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল, যাঃ, মিছে কথা।

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, না রে, মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।

কৈ, পাঁজি দেখি?

নারায়ণী মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুই কি ছেলে রে! মঙ্গলবার পাঁজির নাম করতেও নেই—তুই দেখবি কি রে? এ কথা যে ভোলাও জানে! আচ্ছা, ডাক তাকে।

এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড়বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, এ আমিও জানি। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি?

নারায়ণী তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না, আর দোষ নেই। তাঁহার চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ রে রাম, আমি মরে গেলে তুই কি করিস?

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যাঃ—বলতে নেই।।

নারায়ণী অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো হলুম, মরব না রে!

এবারে রাম পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, তুমি বুড়ো বুঝি? একটি দাঁতও পড়েনি, একটি চুলও পাকেনি।

নারায়ণী বলিলেন, চুল না পাকতেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে মরব। নাইতে যাব, আর ফিরে আসব না।

কেন বৌদি?

তোর জ্বালায়! আমার মাকে তুই দেখতে পারিস নে, দিনরাত ঝগড়া করিস, সেইদিন তোরা টের পাবি, যেদিন আমি আর ফিরব না।

কথাটা রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আচ্ছা আমি আর কিছু বলব না। কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে?

বললেই বা। উনি আমার মা, তোরও গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস, ওঁকেও তেমনি ভালবাসবি। বল্ বাসবি?

রাম আবার বৌদিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। এইখানে মুখ রাখিয়া, সে এই দীর্ঘ তেরো বৎসর বাড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া সে এত বড় মিথ্যা কথা মুখে আনিবে! এ যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য!

নারায়ণী আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, মুখ লুকালে কি হবে, বল্?

ঠিক এই সময়ে দিগম্বরী দেখা দিলেন। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কাজকর্ম নেই নারাণি! দেওরকে নিয়ে সোহাগ হচ্চে, নিজের ছেলেটা যে ওদিকে সারা হয়ে গেল।

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুটা হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নারায়ণী জোর করিয়া তাহার মুখ বুকের উপর টানিয়া লইয়া মাকে বলিলেন, ছেলেটা সারা হয়ে গেল কিসে?

কিসে? বেশ! বলিয়াই দিগম্বরী প্রস্থান করিলেন।

বানাইয়া বলিবার মত একটা মিথ্যাকথাও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, ও ডাইনির আমি গলা টিপে দেব।

নারায়ণী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, চুপ কর্ পাজি, মা হয় যে!

দিন-চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া 'উঃ আঃ' করিয়া বার-দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল—ঐ ডাইনী-বুড়ীর রান্না আমি খাব না, কখ্খন খাব না, ঝালে মুখ জ্বলে গেল, বৌদি—ও—বৌদি—

চীৎকার-শব্দে নারায়ণী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

কি হ'ল রে?

রাম রাগে কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কখ্খন খাব না, কখ্খন খাব না—ওকে দূর করে দাও। বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, মা, বার বার বলি, তরকারিতে এত ঝাল দিও না, অত ঝাল খাওয়া এ বাড়ির কারো অভ্যাস নেই।

দিগম্বরী অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, ঝাল আবার কোথায়? দুটি লঙ্কা শুধু গুলে দিয়েচি, এতেই এত কাণ্ড!

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নাই দিলে মা দুটো লঙ্কা। কেউ যখন খায় না, তখন—

চুপ কর্ নারাণি, চুপ কর্। রান্না শিখোতে আসিস নে আমাকে, চুল পাকালুম এই করে, এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে। ধিক্ আমাকে!

নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া নূতন করিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন।

দিগম্বরী দুয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাই রে! কোথায় আছিস, একবার ডেকে নে! আর সহ্য হয় না। যা মুখে আসে, আমাকে তাই বলে গাল দেয় রে! আমি বুড়ী! আমি ডাইনী! আমাকে দূর করে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে-জামায়ের ভাত খেতে এসেচি–আমার গলায় দেবার দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শতগুণে ভাল। সুরো, আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করব না।

সুরধুনী কাঁদ-কাঁদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

নারায়ণী বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, না, আটকাস্ নে আমাদের নারাণি, যেতে দে। আমরা অনাহারে গাছতলায় মরব সেও ভাল, কিন্তু তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না।

নারায়ণী হাতজোড় করিয়া কহিলেন, কার ওপর রাগ করে যাচ্চ মা? আমরা কি কোন অপরাধ করেছি?

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকিসুরে বলিলেন, আমি কচি খুকি নই, নারাণি, সব বুঝি। তোর ইশারা না থাকলে কি ওর কখন অত সাহস হয়? আমি ডাইনী! অ্যাঁ, আমাকে দূর করে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ-বালাই– গলগ্রহ! পথ ছাড় বলচি।

নারায়ণী মায়ের দুই পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, মা, আজকের মত মাপ কর। আচ্ছা, উনি আসুন, তার পরে যা ইচ্ছে হয় ক'রো। তাহার পর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া লইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ক্রোধটা তাঁহার তখনকার মত শান্ত হইল বটে, কিন্তু দুপুরবেলা শ্যামলাল আহারে বসিতেই তিনি কপাটের অন্তরালে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রথমটা শ্যামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া অর্ধভুক্ত অন্ন ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন।

নারায়ণী বুঝিলেন এ রাগ কাহার উপরে। নৃত্যকালী সহ্য করিতে পারিল না। বাড়ির মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী, চট করিয়া বলিয়া বসিল, দিদিমা, জেনেশুনে ইচ্ছে করে বাবাকে খেতে দিলে না! চোখের জল ত তোমার শুকিয়ে যাচ্ছিল না দিদিমা, না হয় দু'মিনিট পরেই বার করতে!

দিগম্বরী মুখ কালি করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন।

দুপুরবেলা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া তাহার বৌদিদির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া শুইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথাপি আস্তে আস্তে বলিল, ক্ষিদে পায় যে!

বৌদিদি কথা কহিলেন না।

সে আর একটু জোর করিয়া বলিল, কি খাব?

নারায়ণী শুইয়া থাকিয়াই বলিলেন, আমি জানিনে, যা এখান থেকে।

না, যাব না—আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, আমাকে জ্বালাতন করিস নে রাম, নেত্য আছে, তাকে বল্ গে।

রাম আর কিছু না বলিয়া বাইরে আসিয়া নেত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, খেতে দে নেত্য।

নেত্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; এক বাটি দুধ, কিছু মুড়ি ও চার-পাঁচটা নারকেলের নাড়ু আনিয়া দিল।

রাম রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এই বুঝি?

নেত্য বলিল, ছোটবাবু, ভাল চাও ত আজ আর হাঙ্গামা ক'রো না। বাবু না খেয়ে কাছারি চলে গেছে, মা উপোস করে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে—তোমার অদেষ্টে দুঃখ আছে তা বলে দিচ্চি।

রাম তাহা দেখিয়াই আসিয়াছিল, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খানিকটা দুধ খাইয়া মুড়ি ও নাড়ু কোঁচড়ে ঢালিয়া লইয়া পুকুরধারে গাছতলায় গিয়া বসিল। তাহার আহারে প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছিল। বৌদি উপোস করিয়া আছে। সে অন্যমনস্ক হইয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল, তাহার মুনি-ঋষিদের মত কোন একটা মন্ত্র জানা থাকিলে এইখানে বসিয়াই সে বৌদির পেট ভরাইয়া দিত। কিন্তু, মন্ত্র না জানিয়া কি উপায়ে যে কি করা যায়, ইহা সে কোনমতে স্থির করিতে পারিল না। ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে খাইবার

জন্য অনুরোধ করিতে তাহার লজ্জা করিতেও লাগিল। তা ছাড়া দাদা যে খায়নি! অনুরোধ করিলেই বা কি হইবে? সে কোঁচড় হইতে মুড়ি প্রভৃতি জলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, বৌদি উপোস করিয়া আছে। কথাটা সে মনে মনে যত রকম করিয়াই আবৃত্তি করিল, ততবারই তাহার মনের মধ্যে ছুঁচ ফুটিল।

রাত্রে শ্যামলাল ভার্যাকে বলিলেন, আমার আর সহ্য হয় না। ওকে নিয়ে আর বাস করা চলে না।

নারায়ণী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কথা বলচ?

রামের কথা। তোমার মা আমাকে চার-পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত বলচেন, রাম ওঁকে নাহক অপমান করচে। আমি পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগ করে ওকে আলাদা করে দেব। আমি আর পারিনে।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, রামকে আলাদা করে দেবে? ও-কথা মুখেও এনো না। ও দুধের ছেলে, বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে শুনি?

শ্যামলাল বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে! আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ও কি করবে, সে ও-ই জানে।

নারায়ণী বলিলেন, ও জানে না, আমি জানি। কিন্তু মা বুঝি তোমাকে চার-পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত ওই কথা বলে বেড়াচ্ছেন?

শ্যামলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না, উনি কিছুই বলেন না, লোকেরও ত চোখ আছে গো! আমি নিজে কি কিছুই দেখতে পাইনে, তাই তুমি মনে কর?

নারায়ণী বলিলেন, না, আমি তা মনে করিনে। কিন্তু ওর কে আছে, কাকে নিয়ে ও পৃথক হবে? মা আছে, না বোন আছে, না একটা মাসী-পিসী আছে? ওকে রেঁধে খাওয়াবে কে?

শ্যামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি ও-সব জানিনে। মুখে বলিলেন বটে 'জানি না', কিন্তু অন্তরে জানিতেছিলেন। এত বড় সত্যটা না জানিয়া পথ কোথায়? নারায়ণী কি কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভারী গলায় বলিলেন, দেখ, তেরো বছর বয়সে মেয়েরা যখন পুতুল খেলে বেড়ায়, তখন মা আমার মাথায় এই মস্ত সংসারটা ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে স্বর্গে চলে গেলেন। তিনি দেখচেন, এ ভার আমি বইতে পেরেছি কিনা। রেঁধেচি-বেড়েচি, ছেলে মানুষ করেচি, লোক-লৌকতা, কুটুম্ব, সংসার সমস্তই এই একটা মাথায় বয়ে বয়ে আজ ছাব্বিশ বছরের আধ-বুড়ো মাগী হয়েচি'। এখন আমার ঘরকন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে এস, সত্যি বলচি তোমাকে, আমি নদীতে ডুব দিয়ে মরব। তখন আর একটা বিয়ে করে রামকে আলাদা করে দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমনি করে সংসার ক'রো, আমি দেখতেও যাব না, বলতেও যাব না। কিন্তু, এখন নয়।

শ্যামলাল মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করিতেন, আর কথা কহিলেন না। কথাটা এইখানেই সে রাত্রে বন্ধ হইয়া রহিল। পরদিন নারায়ণী রামকে কাছে বসাইয়া গভীর স্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, রাম, তোর এখানে আর থেকে কাজ নেই ভাই। তুই আলাদা কোথাও আলাদা থাক গে যা—পারবি নে থাকতে?

রাম তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, পারব বৌদি। তুমি, আমি, গোবিন্দ আর ভোলা, কবে যাওয়া হবে বৌদি?

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। ইহার পরে কি বলিবেন তিনি! কিন্তু, রাম কথাটা থামিতে দিল না। সে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, কবে যাবে বৌদি?

তিনি সে কথার উত্তরে তাহার মুখটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোর বৌদিকে ছেড়ে একলা থাকতে পারবি নে?

রাম মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আর বৌদি যদি মরে যায়?

যাঃ—

যা নয়। এখন বৌদির কথা শুনিস নে—তখন দেখতে পাবি।

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখন তোমার কথা শুনিনে?

নারায়ণী বলিলেন, কখন শুনিস তাই বল্। কতদিন বলেচি, আমার মাকে তুই অপমান করিস নে, তবু তুই তাঁকে অপমান করতে ছাড়বি নে। কালও করেছিস। এইবার আমি যেখানে দু'চোখ যায়, চলে যাব।

আমিও সঙ্গে যাব।

তুই কি টের পাবি কখন যাব! আমি লুকিয়ে চলে যাব।

আর গোবিন্দ?

সে তোর কাছে থাকবে, তুই মানুষ করবি।

না, আমি পারব না বৌদি।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তোকে পারতেই হবে।

তখন রাম সমস্ত কথাটা অবিশ্বাস করিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া বলিল, সব মিছে কথা। তুমি কোথাও যাবে না।

মিছে নয়—সত্যি। দেখিস, আমি চলে যাব।

রাম অনুতপ্ত হইয়া বলিল, আর যদি তোমার সব কথা শুনি, তা হলে?

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, তা হলে যাব না। তোকেও আর গোবিন্দকে মানুষ করতে হবে না।

রাম খুশী হইয়া বলিল, আচ্ছা, আজ থেকে তুমি দেখো।

.

তিন

আট-দশ দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। দিগম্বরী যে কটাক্ষ করিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু রাম রাগ করিত না। বৌদিদির সেদিনকার কথা ঠিক বিশ্বাস না করিলেও, তাহার ভয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভগবান বিরূপ, আবার দুর্ঘটনা ঘটিল। আজ দিগম্বরী তাঁহার পিতৃদেবের উদ্দেশে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পিতার প্রেতাত্মা এতদিন ছেলের বাড়িতে চুপ করিয়া ছিল, এখন নাত-জামাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল, অবশ্য স্বপ্নে—তবু তাহাকে সন্তুষ্ট করা চাই ত!

সকালবেলা রাম আঁক কষিতেছিল। ভোলা আসিয়া চুপি চুপি খবর দিয়া গেল, দাঠাকুর, ভগা বাগদী তোমার কেত্তিক-গণেশকে চাপবার জন্যে জাল এনেছে, দেখবে এসো।

একটু বুঝাইয়া বলি। বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের রুইমাছ ঘাটের কাছে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে-দুটো আদৌ ভয় করিত না। রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্তিক গণেশ। এ পাড়ায় এমন কেহ ছিল না যে-ব্যক্তি কার্তিক-গণেশের অসাধারণ রূপগুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই, এবং তাহার অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কি যে তাহাদের বিশেষত্ব, তাহা কেবল সে-ই জানিত, এবং কে কার্তিক, কে গণেশ, শুধু সে-ই চিনিত। ভোলাও সব সময় ঠাহর করিতে পারিত না বলিয়া রামের কাছে কানমলা খাইত।

নারায়ণী হাসিয়া বলিতেন, রামের কার্তিক-গণেশ কাজে লাগবে আমার শ্রাদ্ধের সময়।

ভোলার খবরটা রামকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। সে শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, একবার চেপে মজা দেখুক না—জাল ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

ভোলা কহিল, না দাঠাকুর, আমাদের জাল নয়। ভগা জেলেদের মোটা জাল চেয়ে এনেছে—সে ছিঁড়বে না।

রাম শ্লেট রাখিয়া বলিল, চল ত দেখি।

পুকুরধারে আসিয়া দেখিল, তাহার কার্তিক-গণেশের বিরুদ্ধে সত্যই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলা মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উদ্যত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, হতভাগা, মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকচ!

ভগা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হুকুম দিয়ে গিয়েছেন। অন্য মাছ আর পাওয়া গেল না দাঠাকুর।

রাম তাহার হাত হইতে জাল ছিনাইয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা, দূর হ!

ভগা জাল তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাম ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিল। সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিগম্বরী আজ সকাল সকাল আহ্নিক সারিয়া লইতেছিলেন। নেত্য আসিয়া খবর দিল, মাছ পাওয়া গেল না দিদিমা। ছোটবাবু ভগা বাগদীকে মেরেধরে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এই মাছ দুইটার উপর দিগম্বরীর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। বড় রুইমাছের মুড়ার সম্বন্ধে বিধবার মনের ভাব অনুমান করিতে নাই। সুতরাং লোভ তাঁহার ঠিক নিজের জন্য নয় বটে, কিন্তু নিজের কোন একটা কাজে, স্বহস্তে রাঁধিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণের পাতে দিয়া পূণ্য ও খ্যাতি অর্জন করিবার বাসনা অনেক দিন হইতে তিনি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন।

কাল জামাইয়ের মত লইয়া, অর্থাৎ কার্তিক-গণেশ সম্বন্ধে আভাসমাত্র না দিয়া, জেলেদের মোটা জাল চাহিয়া আনাইয়া, প্রজা ভগা বাগদীকে চার আনা বকশিশ কবুল করিয়া সমস্ত আয়োজন একরূপ সম্পূর্ণ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজ সকালেও সে দুইটা প্রাণীকে ঘাটের কাছে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হৃষ্টচিত্তে জপে বসিয়াছিলেন। এমন সময় এরূপ দুঃসংবাদ তাঁহাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল। তাঁহার দাঁত কিড়মিড় করা অভ্যাস ছিল। তিনি অকস্মাৎ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, গলার মালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে, কি শত্তুর আমার। কবে ছোঁড়া মরবে যে, আমার

হাড়ে বাতাস লাগবে। বাসীমুখে এখনো জল দিইনি ঠাকুর! যদি সত্যির হও, যেন তে-রাত্তির না পোহায়।

কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারি কুটিতেছিলেন। তিনি বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'মা!' শুনিয়াছি সন্তানের মুখে মাতৃ-সম্বোধনের তুলনা নাই। নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্বোধনের আজ বোধ করি তুলনা ছিল না। ঐ এক-অক্ষরের ডাকে দিগম্বরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। কিন্তু নারায়ণীও আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চোখ মুছিয়া যেখানে রাম পড়া তৈরি করিতেছিল, সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কঠোর-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা বাগদীকে মেরেধরে হাঁকিয়ে দিয়েছিস?

রাম চমকাইয়া শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া এক মুহূর্ত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, এবং জবাব দিবার লেশমাত্র চেষ্টা না করিয়া ওদিকের দরজা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া ভগা বাগদীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাছ ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রুই ঘাড়ে করিয়া ধড়াস করিয়া উঠানের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মাছ দেখিয়া এখন শিহরিয়া উঠিলেন, শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ওরে, একে ঘাটে ধরিস নি ত? এ রামের কার্তিক-গণেশ নয় ত?

ভগা এত শীঘ্র এত বড় মাছ আনিতে পারিয়া বাহাদুরি করিয়া বলিল, এজ্ঞে হাঁ মাঠাকরুন, এ ঘেটো রুই—বড় জবর রুই!

দিগম্বরীকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ও মাঠাকরুন এনারেই ধত্তে বলে দেছ্‌ল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নৃত্যকালী যদিও রামের উপর খুব সদয় নহে, তবুও মাছ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিগম্বরীকে বলিল, আচ্ছা দিদিমা, পাড়ার লোকে জানে ছোটবাবুর কার্তিক-গণেশের কথা। তুমি কি বলে এ মাছ ধরতে বলে দিলে? দু'তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না? দশটা লোক খাবে, তা একটা আধমণি মাছই বা কি হবে? লুকিয়ে ফেল একে, কোথায় গেছে তিনি, এখনি এসে পড়বে।

দিগম্বরী মুখ ভারী করিয়া বলিলেন, জানি না বাপু অত শত। একটা মাছ ধরেচে ত সাতগুষ্টি মিলে করচে কি দেখ না! একে লুকিয়ে ফেলবি, বামুন খাবে না?

নেত্য বলিল, তোমার বামুন খাবে দুটো-আড়াইটার সময়, ঢের সময় আছে। ছোটবাবু আগে ইস্কুলে যাক, না হলে আজ আর কেউ বাঁচবে না। ও মা! ভোলা এই যে দাঁড়িয়েছিল, সে গেল কোথায়? সে বুঝি তবে খবর দিতে ছুটেচে! যা হয় কর মা, আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

ভগা চার আনা পয়সার লোভে জাল চাহিয়া আনিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া নগদ আদায়ের আশা ছাড়িয়া জাল লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রয়োজন হইলে, কখন কোন্ স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখবে এস দাঠাকুর, ভগা তোমার কার্তিককে মেরেচে।

রাম চিবানো বন্ধ করিয়া বলিল, যাঃ–

সত্যি দাঠাকুর। মা হুকুম দিয়ে ধরিয়েচে, এখনো উঠনে পড়ে আছে; দেখবে চল।

রাম ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে! বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা-ছাগলের মত সে পা ছুঁড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য, কিরূপ দুর্দম, সে বিষয়ে দিগম্বরীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।

তাহাকে খাওয়াইবার জন্য রাত্রে নারায়ণী টানাটানি করিতে লাগিলেন, রাম তাঁহার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং সমস্ত দিন উপবাসের পর গোটা পাঁচ-ছয় ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া গেল।

দিগম্বরী আড়ালে দাঁড়াইয়া জামাইকে বলিলেন, তুমি একবার বল, না হলে নারায়ণী খাবে না, সে সারাদিন উপোস করে আছে।

শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, উপোস কেন?

দিগম্বরী কান্নার অভাবে কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া বলিলেন, আমার এক শ' ঘাট হয়েচে বাবা! কিন্তু কেমন করে জানব বল, পুকুর থেকে বামুন-ভোজনের জন্যে একটা মাছ ধরালে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়!

শ্যামলাল বুঝিতে না পারিয়া ডাকিলেন, নেত্য, কি হয়েচে রে?

নেত্য আড়াল হইতে বলিল, সেটা ছোটবাবুর গণেশ।

শ্যামলাল চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, রেমোর কার্তিক-গণেশের একটা নাকি?

নেত্য বলিল, হ্যাঁ।

আর বলিতে হইল না। তিনি আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, রাম খায়নি বুঝি?

নেত্য বলিল, না।

শ্যামলাল বলিলেন, তবে আর খেতে বলে কি হবে? সে খায়নি, ও খাবে কি!

দিগম্বরী বলিতে লাগিলেন, এমন কাণ্ড হবে জানলে বামুন খাওয়াবার কথাও তুলতাম না বাবা! ও নিজে কেনই বা হুকুম দিয়ে মাছ ধরালে, কেনই বা এমন ধারা করচে, তা সে ও-ই জানে। আমি ত চুপ করেই ছিলাম। তবু সব দোষ যেন আমারই। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা, এখানে একদণ্ডও থাকতে আর ভরসা হয় না।

একটুখানি চুপ করিয়া রীতিমত কান্নার সুরে পুনরায় শুরু করিলেন, কপাল আমার এমন করে যদি না-ই পুড়বে, তবে, অমন ভাই বা মরবে কেন, আমাকেই বা লাথি-ঝাঁটা খেয়ে থাকতে হবে কেন? বাবা, আমরা নিতান্ত নিরুপায়, তাই হাতজোড় করে বলচি, আমাদের একটা-কিছু উপায় তোমাকে করে দিতে হবেই।

শ্যামলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু, হাঁ না, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

নারায়ণী আড়ালে দাঁড়াইয়া নিজের মায়ের এই নির্লজ্জ ঠকামোর লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রামের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন, লক্ষ্মী মানিক আমার! দোরটা একবার খুলে দে!

রাম জাগিয়া ছিল, সাড়া দিল না।

নারায়ণী আবার ডাকিলেন, ওঠ্, দোর খোল্।

এবারে চেঁচাইয়া বলিল, না খুলব না, তুমি যাও। তোমারা সবাই আমার শত্তুর।

আচ্ছা তাই, তুই দোর খোল্।

না, না, না,–আমি খুলব না। সত্যই সে রাত্রে কপাট খুলিল না। শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতে পাইতেছিলেন, নারায়ণী ঘরে আসিতেই বলিলেন, হয় একটা উপায় কর, না হয় যেখানে ইচ্ছে, আমি চলে যাব। এত হাঙ্গামা আমার বরদাস্ত হয় না।

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর দু-তিন দিন কাটিয়া গেলেও যখন রামের রাগ পড়িতে চাহিল না, তখন নারায়ণী ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আজ সন্ধ্যা হয়, তবুও সে ইস্কুল হইতে ফিরিল না দেখিয়া নারায়ণী উৎকণ্ঠিত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, এমন সময় দিগম্বরী নদী হইতে গা ধুইয়া, সংসারের সংবাদ লইয়া, রামের মঙ্গল কামনা করিয়া, বড় মেয়ের সৃষ্টিছাড়া মতি-বুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল প্রতিবাসিনীদের কাছে ঘোষণা করিয়া, শোকে-তাপে অসময়ে অল্পবয়সে নিজের মাথার চুল পাকিবার কারণ দর্শাইয়া, নিজেকে বড় মেয়ে নারায়ণীর প্রায় সমবয়সী বলিয়া প্রচার করিয়া, ভাইয়ের সংসারে কিরূপ সর্বময়ী ছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলিয়া, ধীরে-সুস্থে বাড়ি ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কাণ্ড শুনিয়া তিনি যেন বাতাসে উড়িতে উড়িতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন। উঠানে পা দিয়াই উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তোর গুণধর দেওরের কাণ্ড শুনেছিস নারাণি?

নারায়ণী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিলেন, কি কাণ্ড?

দিগম্বরী বলিলেন, তারা থানায় গেছে। যাবেই ত। যে বজ্জাত ছেলে বাবা, এমনটি সাত-জন্মে দেখিনি! এখন জেলে যান!

তাঁহার মুখে-চোখে আহ্লাদ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। নারায়ণী সে কথার জবাব না দিয়া ডাকিলেন, নেত্য, রাম এখনো এলো না কেন, একবার ভোলাকে পাঠিয়ে দে,–খুঁজে আনুক।

দিগম্বরী বলিলেন, আমি যে সমস্তই শুনে এলুম।

নেত্য শুনিবার আগ্রহে হাঁ করিয়া দাঁড়াইল, নারায়ণী তাড়া দিয়া উঠিলেন, দাঁড়িয়ে থাকলি যে? কথা কানে গেল না বুঝি!

নেত্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, দিগম্বরী কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি হয়েচে জানিস নারাণি–

তুমি ভিজে কাপড় ছাড় গে মা, তার পরেই না হয় ব'লো, বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। দিগম্বরী অবাক হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাস্ রে! মেয়ের রাগ দেখ! এমন একটা কাণ্ড আনুপূর্বিক বলিতে না পাইয়া তাঁহার পেট ফুলিতে লাগিল।

সে কাণ্ডটা সংক্ষেপে এই,–গ্রামের স্কুলে জমিদারদের একটি ছেলে পড়িত। আজ টিফিনের সময় তাহার সহিত রামের তর্ক বাধিল। বিষয়টা জটিল, তাই মীমাংসা না হইয়া মারামারি হইয়া গেল। জমিদারদের ছেলে বলিয়াছিল, শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্মশানকালী রক্ষাকালীর চেয়ে অধিক জাগ্রত। কেননা, শ্মশানকালীর জিভ বড়!

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, শ্মশানকালীর জিভ একটু চওড়া বটে, কিন্তু অত বড়ও নয়, অমন রাঙাও নয়। কিছুদিন পূর্বে পাড়ায় চাঁদা করিয়া রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছিল, সে স্মৃতি রামের মনে উজ্জ্বল ছিল। জমিদারদের ছেলে রামের কথা অস্বীকার করিয়া নিজের করতল তুলিয়া ধরিয়া, বলিল, রক্ষাকালীর জিভ ত এতটুকু!

www.bengaliebook.com

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কি, অতটুকু? কখ্খনো না। এই এত বড়। অতটুকু জিভ হলে কি কখনও পৃথিবী রক্ষা করতে পারে? পৃথিবী রক্ষে করে বলেই ত রক্ষাকালী নাম।

তার পর আর দুই-একটা কথা, এবং তার পরই ঘুষাঘুষি। জমিদারদের ছেলের গায়ে জোর ছিল কম, সুতরাং মার সে-ই বেশী খাইল। নাক দিয়াও ফোঁটা-দুই রক্ত বাহির হইল। এই ক্ষুদ্র স্কুলের জীবনে এত বড় কাণ্ড ইতিপূর্বে ঘটে নাই। যে জমিদারের স্কুল, তাহারই পুত্রের নাকে রক্ত! অতএব হেডমাস্টার নিজে স্কুল বন্ধ করিয়া ছেলেটিকে লইয়া দরবার করিতে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য, রামলাল বহু পূর্বেই অন্তর্ধান হইয়াছিল।

ভোলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দাঠাকুরকে পাওয়া গেল না। অনতিকাল পরে শ্যামলাল মুখ কালি করিয়া বাড়ি আসিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওগো শুনচ? এ গ্রাম থেকে বাস উঠাতে হ'ল দেখচি। চাকরি করে দু'পয়সা ঘরে আনছিলুম, তাও বোধ করি এবার ঘুচল। নারায়ণী ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া একটা চৌকাঠে ভর দিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরা থানায় গেছেন, না?

শ্যামলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, বাবু শিবতুল্য লোক, তাই মাপ করেচেন, কিন্তু আরো পাঁচজন আছে ত? দিন দিন একটা নূতন ফ্যাসাদ তৈরি হলে কি করে গ্রামে বাস করি, বল! রাম কৈ?

নারায়ণী বলিলেন, সে এখনো আসেনি। বোধ করি, ভয়ে পালিয়েছে।

শ্যামলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালালেও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই, না পালালেও নেই। সে সৎমার ছেলে, লোকে নিন্দা করবে, তাই এতদিন কোনমতে সহ্য করেছিলুম, কিন্তু আর নয়। এখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

দিগম্বরী রান্নাঘরের বারান্দা হইতে বলিলেন, নিজের ছেলেটার পানেও ত চাইতে হবে।

শ্যামলাল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, হবে না, মা, নিশ্চয় হবে। তাই কাল পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-সম্পত্তি আলাদা করে ফেলব। আর তোমাকেও বলে রাখলুম, এ নিয়ে ওকে বকাঝকা করবার দরকার নেই। ও যা ভাল বোঝে, তাই করে। ভাল বুঝেচে, মনিবের ছেলের গায়ে হাত তুলেচে।

দিগম্বরী মনে মনে পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, নারাণি কেন যে ওকে শাসন করতে যায়—আমার ত দেখে ভয়ে বুক কাঁপে। যে গোঁয়ার ছেলে, ও আমাকেই যখন অপমান করে, তখন ওকে অপমান করে ফেলবে, এ কি বেশী কথা! আমি বলি, মন! নিজের মান নিজের ঠাঁই,—রামের কথায় থেকো না।

শ্যামলাল শ্বশ্রূর এ কথাটায় আর সায় দিতে পারিলেন না, বোধ করি, চক্ষুলজ্জা হইল। বলিলেন, যাই হোক, ওকে শাসন করবার দরকার নেই।

নারায়ণী পাথরের মূর্তির মত নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া সমস্ত শুনিলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। তার পর ধীরে ধীরে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টা-খানেক পর নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবু ঘরে এসেছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া, রামের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিলেন। রাম খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল, দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বৌদিদি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ঘরের কোণে তাহারই একগাছা পাতলা বেতের ছড়ি ছিল, তাহাই তুলিয়া লইতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া খাটের ওধারে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী ডাকিলেন, এদিকে আয়।

রাম হাতজোড় করিয়া বলিল, আর করব না বৌদি! এইবারটি ছেড়ে দাও।

নারায়ণী কঠিন হইয়া বলিলেন, এলে কম মারব, কিন্তু না এলে এই বেত তোমার পিঠে ভাঙব।

রাম তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া মিনতি করিতে লাগিল, তিন সত্যি করছি বৌদি, আর কোন দিন করব না, কান মল্‌ছি বৌদি–

নারায়ণী খাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সপাৎ করিয়া এক ঘা বেত তাহার ঘাড়ের উপর বসাইয়া দিলেন; তাহার পর বেতের উপর বেত পড়িতে লাগিল। প্রথমটা সে ওদিকের দোর খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, তারপর ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল, শেষে পায়ের তলায় পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল। নেত্য পেছনে আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল, কাঁদিয়া বলিল, মা, ছেড়ে দাও মা। আমি ঘাট মানচি–

দিগম্বরী খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই সব কাজে কথা কইতে আসিস কেন বলত?

শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, কি হচ্চে ও–সারারাত ঠেঙাবে নাকি?

নারায়ণী বেত ফেলিয়া বলিলেন, মনে থাকে যেন!

.

চার

রাম ভাত খাইতে বসিয়াছিল। দিগম্বরী আড়ালে বসিয়া সুর তুলিয়া বলিলেন, অত বড় ছেলেকে অমন করে মারা কেন? ওর বড়ভাই কোনদিন গায়ে হাত তোলে না।

নেত্য কাজ করিতে করিতে বলিল, তুমি কম নও, দিদিমা! তুমিই ত ও-সব কথা মাকে এসে লাগাও।

সে রাত্রে অত মার তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই; রাম শুনিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, ডাইনী বুড়ী আমাদের সব খেতে এসেছে!

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, নারাণি, শুনে যা তোর দেওরের কথা।

নারায়ণী স্নান করিতে যাইতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া ক্লান্তভাবে বলিলেন, পারিনে মা, আর কথা শুনতে; সত্যি বলচি নেত্য, মরণ হলে আমার হাড় জুড়োয়—আর সহ্য হচ্ছে না। ওরে ও বাঁদর, এখনো তোর পিঠের দাগ মিলোয় নি, এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি!

রাম জবাব দিল না, ভাত খাইতে লাগিল। নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। উঠানের উপরেই একটা পিয়ারাগাছ ছিল, ভাত খাইয়া রাম তাহার উপর উঠিল এবং নির্বিচারে কাঁচা-পাকা পিয়ারা চর্বণ করিতে লাগিল। কোনটার কতকটা খাইল, কোনটার একটু কামড়াইয়াই ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কাঁচাগুলা নিরর্থক ছিঁড়িয়া এদিকে-ওদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। দেখিয়া দিগম্বরীর গা জ্বালা করিতে লাগিল। নারায়ণী বাড়িতে নাই, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, তোমার জন্য ত বাছা, পাকা পিয়ারা দাঁতে কাটবার জো নেই, কাঁচাগুলো নষ্ট করে কি হচ্ছে?

রাম কোনদিনই তাঁহার কথা সহিতে পারিত না। বিশেষ, এইমাত্র নেত্যর কাছে মার খাইবার কারণ জানিতে পারিয়া, রাগে ফুলিতেছিল, গাছের উপর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বেশ করচি—বুড়ী!

এই বিশেষণটা দিগম্বরী সবচেয়ে অপছন্দ করিতেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, বুড়ী! বেশ কচ্চ? আচ্ছা, আসুক সে। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হওয়া চাই ত! কি বেহায়া ছেলে বাবা!—মার খেয়ে পিঠের চামড়া উঠে গেল, তবু লজ্জা হ'ল না!

রাম উপর হইতে বলিল, ডাইনী বুড়ী!

ডাইনী বুড়ী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! পাজী হারামজাদা, নাব বলচি।

রাম বলিল, নাবব কেন? তোমার বাবার গাছ?

দিগম্বরী ক্ষেপিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, অ্যাঁ—বাপ তুললি? শুনলি নেত্য, শুনলি?

ঠিক এই সময় নারায়ণী ঘাট হইতে আসিয়া পড়িলেন। গাছের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন, ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলিনে? গাছে চড়েছিস যে!

রাম ভাবিয়া রাখিয়াছিল, গাছের উপর হইতে দূরে বৌদিকে আসিতে দেখিয়াই সে নামিয়া পলাইবে। কিন্তু ঝগড়ায় ব্যস্ত থাকায় পথের দিকে নজর করে নাই। বৌদিদি একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে ভয়ে বলিল, পিয়ারা খাচ্চি।

তা ত খাচ্চিস—ইস্কুলে গেলিনে?

আমার পেট কামড়াচ্চে যে!

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তাই ভাত খেয়ে উঠে কাঁচা পিয়ারা চিবোচ্চ?

দিগম্বরী মেয়ের গলা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—হারামজাদা ছোঁড়া আমার বাপ তোলে! বলে, নাবব কেন—তোমার বাপের গাছ?

নারায়ণী চোখ তুলিয়া বলিলেন, বলেছিস?

রাম চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, না বৌদি, বলিনি।

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলিস নি হারামজাদা! নেত্য সাক্ষী আছে। তার পর মুখ বিকৃত করিয়া সানুনাসিক সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন, সেদিন যখন বেতের উপর বেত পড়েছিল, তখন—আর করব না বৌদি—পায়ে পড়ি বৌদি—মরে গেলুম বৌদি,—চেপে ধরলে চিঁচিঁ কর, আর ছেড়ে দিলে লাফ মার, হারামজাদা!

রাম আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হাতে একটা বড় কাঁচা পিয়ারা ছিল—ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া দিল। সেটা দিগম্বরীকে স্পর্শ করিল না, নারায়ণীর ডান ভ্রূর উপরে গিয়া সজোরে আঘাত করিল। এক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখিয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। দিগম্বরী ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি করিয়া উঠিলেন, নেত্য কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, রাম গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারিল।

দুপুরবেলা শ্যামলাল স্নানাহার করিতে আসিয়া দেখিলেন বিষম কাণ্ড! নারায়ণী নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার ডান চোখ ফুলিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহার উপর ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া নেত্য পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। দিগম্বরী আজ আর আড়ালে গেলেন না, সামনেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, রাম মেরে ফেলেচে নারাণীকে।

শ্যামলাল চমকাইয়া উঠিলেন। কাছে আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কঠিনভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, আজ তোমাকে আমি দিব্যি দিচ্ছি—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোনদিন কথা কও—যদি কোন কথায় থাক, সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, চুপ কর, চুপ কর—ও-কথা মুখে এনো না।

শ্যামলাল বলিলেন, আমার এত বড় দিব্যি যদি না মানো, সেই দিনে যেন তোমাকে আমার মরা-মুখ দেখতে হয়। বলিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে বেড়াইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, অসম্ভব কল্পনা করিয়া রাম সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ি ঢুকিল। দেখিল, উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়িটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। নাড়া দিয়া দেখিল, বেশ শক্ত, ভাঙ্গা যায় না। রান্নাঘরে আলো জ্বলিতেছিল, চুপি চুপি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেখানেও ওই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরে কেহ নাই, শুধু একরাশ পিতল-কাঁসার বাসন মেজের উপর পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা যে কি, তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, সকালবেলার কাণ্ডটার সহিত কেমন করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। তখন ফিরিয়া গিয়া সে চুপ করিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়া বাটীর অপর খণ্ডের গতিবিধি শব্দসাড়া শুনিতে লাগিল। ইতিপূর্বে তাহার যে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, এখন সে কথাও ভুলিয়া গেল। রাত্রি তখন বোধ করি নয়টা, সে ঘুরিয়া গিয়া খিড়কির দরজায় ঘা দিতেই নেত্য কপাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাম জিজ্ঞাসা করিল, বৌদি কোথায় নেত্য?

ঘরে শুয়ে আছেন।

রাম ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বৌদি খাটের উপর শুইয়া আছেন, এবং নীচে মাদুর পাতিয়া দিগম্বরী ছোট মেয়েটিকে লইয়া বসিয়া আছেন। গোবিন্দ খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিয়া দিল, কাকা, তোমার বাড়ি ওদিকে, এদিকে আমাদের বাড়ি। বাবা বলেচে, তুমি এ-ঘরে ঢুকলে পা ভেঙ্গে দেবে।

রাম খাটের উপর নারায়ণীর পায়ের কাছে গিয়া বসিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। রাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিগম্বরী তাঁহার ছোট মেয়েকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, সুরো, বল না তোর দাদাবাবু কি বলেচে ওকে।

সুরধুনী মুখস্থর মত গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল–দাদাবাবু বলেচে, তুমি এখানে এসো না। কাল সকালে সব–কি মা?

দিগম্বরী বলিলেন, বিষয়-সম্পত্তি।

সুরধুনী বলিল, বিষয়-সম্পত্তি কাল ভাগ-বাটরা করে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, দিব্যি দেবার কথাটা বল্ না—ন্যাকা মেয়ে!

সুরধুনী বলিল, দাদাবাবু দিব্যি দিয়েচেন দিদিকে,—খেতেও দেবে না, কথাও বলবে না—বললে দাদাবাবু—। নারায়ণী বিছানার উপর হইতে ধমক দিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, হয়েচে হয়েচে, তুই চুপ কর্।

তখন দিগম্বরী বলিলেন, তা সত্যি বাছা! তুমি মানুষ-জনকে আধ-খুন করে ফেলবে—সে দিব্যি না দিয়ে আর করে কি! আমি ত বাপু, কিছুতে তার দোষ দিতে পারব না—তা যে যাই বলুক! এ বাড়িতে তোমার আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া আর চলবে না। ওকে সোয়ামীর মাথার দিব্যিটা ত মানতে হবে?

সুরধুনী বলিল, মা, ভাত দেবে চল না।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সবুর কর বাছা।

রাম তখনও বসিয়া আছে; এমন অবস্থায় ঘরে-দোরে আগুন ধরিয়া গেলেও ত তিনি উঠিতে পারেন না। রামের বুকের ভিতর চাপা কান্না মাথা খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু দিগম্বরীর সেই সকালবেলার খোনা কথার ভ্যাংচানি তাহার বুকের উপর পাথর চাপাইয়া পথ আটকাইয়া রাখিল। একবার সে কাঁদিতে পারিল না, একবার বলিতে পারিল না, 'আর করব না বৌদি!' এই একটা কথা অনেক আপদে-বিপদেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—আজ তাহাই বলিতে না পাইয়া তাহার দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময়ে নারায়ণী ক্লান্তভাবে বলিলেন, সুরো, যেতে বল্ ওকে।

এবার সে কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল,—যেতে বল্ ওকে! আমার খিদে পায় না বুঝি! সেই ত কখন খেয়েচি!

নারায়ণী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, একেবারে খুন করে ফেলতে পারেনি? তা হলে দশহাতে খেতো! আমি জানিনে—যাক ও নেত্যর কাছে।

যাব না নেত্যর কাছে। আমি কারো কাছে যাব না—আমি না খেয়ে উপোস করে শুয়ে থাকব। বলিতে বলিতে রাম দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া বাড়িঘর কাঁপাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইল। নেত্য কিছু খাবার আনিয়া বলিল, ছোটবাবু ওঠ, খাও।

রাম লাফাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল, দূর হ, পোড়ারমুখী—দূর হ!

নেত্য খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল, রাম থালা-গেলাস ঝনঝন করিয়া উঠানের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সকালবেলা শ্যামলাল কাজে চলিয়া যাইবার পরে, রাম নিজের উঠানে পায়চারি করিতে করিতে গর্জাইতে লাগিল—আমি দিব্যি মানিনে! ওঃ ভারী দিব্যি! ও কে যে, দিব্যি দেয়? ও কি আমার আপনার দাদা? ও কেউ নয়, ওর কথা আমি মানিনে। আমি কি ওকে মেরেচি? বুড়ী ডাইনীকে মেরেছি। ও ত শুধু বৌদিকে লেগেছে, তবে ওরা কেন দিব্যি দিতে আসে!

এ-সকল কথার কেহই জবাব দিল না, খানিক পরে সে সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিল—বেশ ত! ভালই ত! না-ই কথা কইলে, না-ই খেতে দিলে! আমি মজা করে রাঁধব—ভাত, ডাল, ভাল ভাল তরকারি, মাছ—একলা বেশ পেট ভরে খাব। আমার কি হবে?

এ কথারও কেহ জবাব দিল না। তখন সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া খনখন ঝনঝন শব্দে থালা, ঘটি, বাটি নাড়িয়া চাড়িয়া কাজ করিতে লাগিল। হাঁক-ডাক করিয়া ভোলাকে চাল-ডাল ধুইয়া আনিতে, তরকারি কুটিতে আদেশ দিল। সমস্তই নেত্য রান্নাঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। ভোলাকে হুকুম করিল, তুই আমার চাকর, ও-বাড়ি যাস্‌নে। ও-বাড়ির কেউ যদি এদিকে আসে, তার পা ভেঙ্গে দিবি—বুঝলি ভোলা, নেত্য আসুক একবার এদিকে।

নারায়ণী রান্নাঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। দিগম্বরী কৌতূহলী হইয়া মাঝে মাঝে বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলেন। খানিক পরে বড় মেয়ের কাছ উঠিয়া আসিয়া হাসি চাপিয়া ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা, বাছার কি বুদ্ধি! উনি আবার ভাল তরকারি রেঁধে খাবেন! একটা পেতলের হাঁড়িতে প্রায় এক কাঠা চাল গলায় গলায় তুলে দিয়ে রান্না চড়িয়েচে—তাতে জল দিয়েচে এক ফোঁটা। একজন খাবে ত, রাঁধছে দশজনের, তাই বা সেদ্ধ হবে কি করে? পুড়ে আঙরা উঠবে যে! ঐ হাঁড়িতে কি অত চাল ধরে, না, ঐটুকু জলের কর্ম! আবার রাঁধিয়ে বলে দেমাক আছে! রাঁধি বটে আমরা, কিন্তু দেমাক কত্তে জানিনে! ভাত রাঁধব, তা এমন জল দেব, আর দেখতে হবে না—চোখ বুজে সেদ্ধ হবে! কৈ রাঁধুক দিকি আমার সঙ্গে! লোকে খেয়ে কারটা ভাল বলে দেখি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

নেত্য কাছে ছিল, সে বলিল, দিদিমার এক কথা। ও কি কোনদিন এক ঘটি জল গড়িয়ে খেয়েছে যে, আজ রেঁধে খাবে?

সে অনেক দিনের দাসী, এ-সব ব্যাপার তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

মায়ের দেখাদেখি সুরধুনীও মাঝে মাঝে গিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। ঘণ্টাখানেক পরে ছুটিয়া আসিয়া দিদির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—ও দিদি,

দেখবে এস—রামদাদা—মা গো! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো শুধু খাচ্চে। কিচ্ছু নেই দিদি—একেবারে শুধু ভাত, আচ্ছা দিদি, কাঁচা ভাতে পেট কামড়াবে না?

নারায়ণী তাহার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে যে কত দুঃখে, কত বড় ক্ষুধার তাড়নে এইগুলা খাইতে বসিয়াছে, সে কথা তাঁহার অগোচর রহিল না।

দুপুরবেলা শ্যামলালের খাওয়া হইয়া গেলে, দিগম্বরী ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, যা পারিস, দুটি খেয়ে নে নারাণি! ওর তাড়সে জ্বরের মত হয়েচে,—ওতে খাওয়া চলে। আমি বলচি, ক্ষেতি হবে না।

নারায়ণী মোটা চাদরটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ভাল করিয়া শুইয়া বলিলেন, আমাকে বিরক্ত ক'র না মা, তোমরা খাও গে।

দিগম্বরী বলিলেন, ভাত না খাস, দু'খানা রুটি ক'রে দি—না হয়—

নারায়ণী কহিলেন, না, কিচ্ছু না।

দিগম্বরী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা? কাল থেকে উপোস করে আছিস, আজ দুটি না খেলে হবে কেন?

নারায়ণী জবাব দিলেন না। নেত্য আসিয়া বলিল, তুমি মিথ্যে বকে মরচ দিদিমা। ঐখানে দাঁড়িয়ে একবেলা চেঁচালেও ওঁকে খাওয়াতে পারবে না। জ্বর হয়েছে, একটু ঘুমোতে দাও।

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন, বলিতে বলিতে গেলেন, জানিনে বাপু, নাগ্‌লে-টাগ্‌লে একটু জ্বরভাব হয়, তাই বলে কি মানুষ উপোস করে পড়ে থাকে? আমরা ত পারিনে।

বৈকালে নারায়ণী আবার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন, এবং যতবার নেত্যর চোখে চোখে হইল, ততবারই কি কথা বলিতে গিয়া যেন চাপিয়া গেলেন।

রাম স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া আনিল। খাইতে খাইতে গলা বড় করিয়া বলিল, কি আর ক্ষেতি হ'ল আমার? ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলুম, আবার ফিরে এসে কেমন খাচ্চি।

বেড়ার ওদিকে সকলেই রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু সকালের মত এখনও কেহ জবাব দেয় না দেখিয়া সে আরও অস্থির হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, এই দিকটা আমার সীমানা। কোনদিন নেত্য কি কেউ যদি আমার সীমানায় আসে, তখন পা ভেঙ্গে দেব।

এই পা-ভাঙ্গার ভয় সে ইতিপূর্বেও দেখাইয়াছিল, সেবারেও যেমন ফল হয় নাই, এবারেও হইল না। কেহ ভয় পাইয়াছে কিনা, বোঝা গেল না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবার চেঁচামেচি করিতে লাগিল, আমার কাঠ কৈ, আমি রাঁধব কি দিয়ে? আমার শিলনোড়া কৈ, আমি বাটনা বাটব কিসে? ও-ঘর হইতে নেত্য বলিল, মা বলেচেন, কাল শিলনোড়া কিনে দেবেন।

না, আমি কেনা শিলনোড়া চাইনে। বলিয়া সে কাঁদিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন আমার গণেশকে ধরালে? কেন, আমাকে খোনা খোনা করে ও বুড়ী ভেঙালে, বেশ করেচি গাল দিয়েচি—ও মরে আর জন্মে পেত্নী হবে।

দিগম্বরী চোখ কটমট করিয়া বলিলেন, শুনলি নারাণি, শুনলি! এ-সমস্ত পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করা নয়?

নারায়ণী চুপ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া ছিলেন, সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

.

পাঁচ

পরদিন সকাল হইতে রামের কথাবার্তা বদলাইয়া গেল। সম্পূর্ণ দুইটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, বৌদিদি ডাকে নাই, বকে নাই, খাইতে দেয় নাই, এ-রকম সে তাহার জ্ঞানে দেখে নাই। আজ সে বাস্তবিক ভয় পাইয়াছিল। প্রথমটা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে নানারূপ উলটা-পালটা জবাবদিহি করিল। একবার বলিল, বেড়াল মারিতে পিয়ারা ছুড়িয়াছিল; একবার বলিল, হাত ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়া বৌদির কপালে লাগিয়াছিল; একবার বলিল, কাঁচা পিয়ারা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তার পর একবার বলিল, কাহাকেও সে গাল দেয় নাই; একবার বলিল, গোবিন্দকে দিয়াছিল; একবার বলিল, ভোলাকে দিয়াছিল। কিন্তু কোন কৈফিয়তেই কাজ হইল না। ও-ধারের কেহ জবাব দিল না, প্রতিবাদ করিল না, হাঁ, না একটা কথাও বলিল না। একবার বহু কষ্টে লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া 'আর কোনদিন করব না' বলিয়া ফেলিয়াও যখন ফল হইল না, তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি উপায়ে কি দিয়া কেমন করিয়া সে বৌদিকে প্রসন্ন করিবে? বৌদিরা তাহাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে, তবে কোথায় সে খাইবে? কাহার কাছে কেমন করিয়া সে থাকিবে? কোন দিকেই আজ সে কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। আজ সে রাঁধিবার চেষ্টা করিল না, পড়িতে গেল না, ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল।

গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বোধ করি, গত রাত্রে নারায়ণীর জ্বর আসিয়াছিল। দুপুরবেলা দিগম্বরী এক বাটি দুধ আনিয়া বলিলেন, খেতেই হবে। না খেয়ে কি মরবি? নারায়ণী প্রতিবাদ না করিয়া দুধের বাটি হাতে লইয়া কতকটা খাইয়া বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার 'না, না' করিয়া কথা কাটাকাটি করিতে ঘৃণা বোধ হইল।

রাত্রি যখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবুর ত কোন সাড়াশব্দ পাইনে—রাত ত ঢের হ' ল!

নারায়ণী উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার, দেখে আয়, সে ঘরে আছে কিনা।

নেত্যর চোখ ভিজিয়া উঠিল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার যেতে সাহস হয় না মা! বলিয়া বাহিরে গিয়া ভোলাকে সে ডাকিয়া আনিল। ভোলা সংবাদ দিল—দাঠাকুর ঘরে আছে, ঘুমুচ্ছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাত না হইতেই তিনি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন।

রান্না যখন প্রায় অর্ধেক অগ্রসর হইয়াছে, তখন দিগম্বরী গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কর্কশ-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোর না জ্বর নারাণি? তুই না তিন দিন খাসনি? ভোরবেলা উঠে চান করে এসে এ-সব কি হচ্ছে, জিজ্ঞেস করি?

নারায়ণী স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, রাঁধচি, দেখতে ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি, কিন্তু কেন? কেন শুনি? তুই কি আমার হাতে খাবিনি?

নারায়ণী জবাব দিলেন না, কাজ করিতে লাগিলেন।

কাল সমস্ত দিন ধরিয়া রাম এই একটা কথা ভাবিতেছিল,—বৌদিদির না জানি কত লাগিয়াছে! একটা কাঁচা পিয়ারা লইয়া বার বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের

গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এই কুকর্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্বে বৌদি তাহাকে এখানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শেষে স্থির করিল, সে আর কোথাও চলিয়া গেলে বৌদি খুশী হইবে। তাহার মামার বাড়ি তারকেশ্বরের ওদিকে, অথচ কোথায়, সে ঠিক জানে না। সেইখানে গিয়া খুঁজিয়া লইবে সঙ্কল্প করিয়া সে একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া প্রভাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী রান্না শেষ করিয়া একখানি থালায় সমস্ত দ্রব্য পরিপাটি করিয়া সাজাইতেছিলেন। দ্বারের কাছে ভোলা আসিয়া ডাকিল, মা!

নারায়ণী ফিরিয়া ভোলাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে ভোলা?

এ কয়টা দিন সে বাহিরে গরুর সেবা করিত বটে, কিন্তু রামের ভয়ে ভিতরে আসিত না। ভোলা আস্তে আস্তে বলিল, চুপি চুপি একটা কথা আছে, মা।

নারায়ণী কাছে আসিতেই ভোলা ফিসফিস করিয়া বলিল, তুমি যা বলেছিলে মা, তাই হয়, যদি দুটি টাকা দাও।

নারায়ণী বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি হয় রে? কাকে টাকা দিতে হবে?

ভোলা একটুখানি আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি দাঠাকুরকে চলে যেতে বলেছিলে না! তিনি যেতে রাজী আছেন—আচ্ছা, দুটো না দাও, একটি টাকা দাও।

নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজি আছে রে? কোথায় সে?

ভোলা বলিল, বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন! বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ি আছে যে!

যা ভোলা, শিগগির ডেকে আন—বল, আমি ডাকচি।

ভোলা ছুটিয়া গেল, নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনতিকাল পরেই রাম একটি ছোট পুঁটুলি হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নারায়ণী নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন।

দূর হইতে দিগম্বরী রামকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সাজানো থালার সুমুখে নারায়ণীর কোলের উপর বসিয়া রাম বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছে, এবং তাহার মাথার উপর, পিঠের উপর, আর একজনের অশ্রু বৃষ্টির ধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, ওঃ—তাই এত রান্না! খাওয়ান হবে বুঝি!আমার জামাই যে এত বড় দিব্যিটা দিলেন, সেটা ভেসে গেল বুঝি?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, ভেসে যাবে কেন মা, তাঁর কথা আমি অমান্য করিনি, তিন দিন খাইনি, খেতেও দিইনি।

দিগম্বরী তীক্ষ্ণ ভাবে বলিলেন, এই বুঝি? অমান্য করিস নি, তবে এ কি হচ্চে? যে দিব্যি দিয়েচে তার বুঝি হুকুমটাও একবার নিতে হবে না?

নারায়ণী কি যেন একটা কঠিন আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, আমার হুকুম নেওয়া হয়েছে।

দিগম্বরী বিশ্বাস করিলেন না। অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি কচি খুকি নই নারাণি। হুকুম নিলি, আর আমি জানতেও পারলুম না?

এবার নারায়ণীর আর সহ্য হইল না। তিনিও কঠিন হইয়া বলিলেন, তুমি কি জানবে মা, কার কাছে কখন আমি হুকুম পেয়েচি? মা, যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু—বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বুকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বুকে করে এতটুকুকে বড় করে তুলতে হয়, সে-ই জানে, হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে। তোমাকে ভাবতে হবে না মা; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দু'টো খাইয়ে দিই । ও আমার তিন দিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দিগম্বরী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, এখানে তবে আর আমার কি করে থাকা হবে? এ বাড়িতে আর থাকতে পারব না, তা তোকে আজ স্পষ্ট বললুম।

নারায়ণী বলিলেন, আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারছিলুম না, মা, সত্যিই তোমার এখানে থাকা হবে না। তোমার চোখে চোখে আমার এত বড় ছেলে যেন আধখানা হয়ে গেছে। ও দুষ্ট হোক যা হোক, আমার বাড়িতে আমার চোখের সামনে ওকে শাস্তি দিতে আমি কাউকে দেব না। আজ তুমি থাক, কাল কিন্তু বাড়ি যেয়ো। তোমার খরচপত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।

দিগম্বরী কাঠ হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রাম বুকের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বলিল, না বৌদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হয়েছি, আমার সুমতি হয়েছে—আর একটিবার তুমি দেখ।

নারায়ণী আর একবার তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধার স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই এখন ভাত খা।